সংবাদ

তারিখ ...... 20 APR 2017
পৃষ্ঠা ৭ ...... কলাম ৬ ......

সবাই যা দেখে

স্কুলের বাংলা বইয়ে হামলা এনসিটিবির কিছু করার ছিল

আব্দুল মান্নান খান

এতদিন জেনে এসেছি একজন কবি কখন কোন অবস্থায় কোন উপলব্ধিতে কি লেখেন তা অন্য যে কেউ তার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারেন কিন্তু কবিতার কোন একটা শব্দ, দাঁড়ি-কমা কোথাও হাত দিতে পারেন না। যারা গত হয়েছেন তাদের কোন কিছুতে কোন পরিবর্তন আনার অধিকার কারো নেই। যারা জীবিত আছেন তাদের কাছে এমন কোন প্রস্তাব গেলে তারা যদি সেটা বিবেচনা করেন সে ভিন্ন কথা। আবার শুধু কবিতার পরে হাত দেয়া কেন কর্তৃপক্ষ চাইলে পুরো পাঠ্যবই নতুন করে লিখেও নিতে পারেন। তবে সে পারা গায়ের জোরে পারা। ক্ষমতার অন্ধে পারা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে পারা আখেরে টেকে না। অতীতেও এমন হয়েছে টেকেনি। ওই যে বলে না, ইতিহাসের শিক্ষা হলো, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। সে যাহোক, হেফাজতে ইসলাম বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এত বড় বিশারদ কবে হয়ে গেল যে, তাদের কথায় স্কুলের প্রায় সকল শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যক্রম রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গেল! কোন কোন কবিতায় আবার তারা তাদের পছন্দ মতো শব্দও বসিয়ে দিল। কিন্তু কথা হলো, তাদের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে একটা পাঠ্যক্রম তারা দাঁড় করিয়ে এনসিটিবির হাতে দিল আর এনসিটিবি সেটা বাস্তবায়ন করে দিল! তাও আবার করে দিল প্রেস থামিয়ে দিয়ে যখন ছাপা হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকার বই! একে কী বলা যাবে, তুঘলোকি কাণ্ড না আর কিছু? টাকার কথা না হয় বাদই দিলাম 'লাগে দেবে গৌরী সেন'। তারপর প্রবাদ আছে, মানি লস্ট নাথিং লস। তার সঙ্গে হাজার হাজার কোটি টাকার যে কাহিনী বিভিন্ন সময়ে শোনা যায় সেখানে আরও না হয় চারশ কোটি টাকা যুক্ত হলো এতে কি আর এসে গেল। এখানে ছোট বেলায় গাঁয়ের লোকের কাছে শোনা একটা কথা বলা লাগে, 'গেল গেল পাঁচসিকের মুরগি গেল শিয়ালের মন তো বোঝা গেল'। এখন তো বোঝা গেল কার দৌড় কতদূর।

ভাষা শহীদের রক্ত ছুয়ে শপথ নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রামের পর একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়েছি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। ভাষাভিত্তিক একটি জাতিরাষ্ট্র আমাদের। সে ভাষার প্রতি আমাদের মমত্ববোধ কতখানি তা সাম্প্রদায়িক একটা মহল এবার দেখিয়ে দিল ভালো করে। এনসিটিবির বড় কর্মকর্তারা অধিকাংশ সেখানে ডেপুটেশনে কর্মরত। শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর মতো গুরু দায়িত্ব রেখে কারিকুলাম প্রণয়নের মতো অধিকতর গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য তারা সেখানে আছেন। তারপর প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যক্রম তৈরিতে ওখানে যারা আছেন তারা তো আছেনই তাছাড়া সম্মানের সঙ্গে যাদের ডেকে নিয়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তারা প্রত্যেকে স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, পদস্থ এবং খ্যাত। একা কেউ কিছু শেষ করতে পারেন না। প্রত্যেকে একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে বা কমিটিতে থেকে কাজ করেন। এবং সম্পাদনার কাজ শেষ হওয়া না পর্যন্ত তারা থাকেন সরাসরি সম্পৃক্ত। রচনায়-সম্পাদনায় কারা থাকেন তা যে কোন একটা বইয়ের পাতা উল্টালেই দেখা যায়। সম্পাদনা কমিটি কাজ শেষ করার পরে নিখুঁত বই বার করার দায়িত্ব এনসিটিবির। নতুন কোন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে তখন আর এনসিটিবির পারার কথা না। করতে হলে আবার ওই সম্পাদনা কমিটি লাগবে। কাজেই এখানে আর কারো ওপর দায়িত্ব চাপানোর সুযোগ নেই। এর পর যখন প্রেসে যায়, ছাপার কাজ শুরু হয় তখন এনসিটিবির সঙ্গে যুক্ত হয় অধিদফতরের নিচের দিকের কিছু কর্মকর্তা। এনসিটিবির এবং শিক্ষা অধিদফতরের অফিসারদের সমন্বয়ে গঠিত হয় একেকটা গ্রুপ। গ্রুপের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট প্রেসগুলোর নাম-ঠিকানা উল্লে-খসহ একটা তালিকাও ধরিয়ে দেয় হয় তাদের হাতে। তাদের কাজ হলো ওই তালিকা অনুযায়ী তারা ঘুরে ঘুরে প্রেসের কাজ তদারকি করবে এবং নিয়মিত ভাবে পরের দিন সকালে এনসিটিবির সভাকক্ষে বড় কর্তার উপস্থিতিতে রিপোর্ট পেশ করবেন। কাজের অগ্রগতি এবং কোথায় কী সমস্যা তা রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে। শুধু কাজের অগ্রগতি দেখলে হবে না। কাজের মান দেখতে হবে। যেমন যে মানের কাগজ ছাপানোর কাজে ব্যবহার করার কথা তা করা হচ্ছে কি না, ছাপার কাজে রঙ-কালি ঠিক মতো আসছে কিনা সবশেষে ভাঁজাই বাঁধাই কাটিং ঠিক মতো হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে নোট রাখতে হবে এবং ওই সভায় তা পেশ করতে হবে। কোন প্রেস পিছিয়ে পড়লে দ্রুত কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন রিপোর্ট মোতাবেক । শেষ পর্যন্ত, প্রেস থেকে বই ট্রাকে উঠে জেলার উদ্দেশে রওনা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা গ্রুপকে ওই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। অন্তত আমি তাই জানতাম কয়েক বছর আগ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে চাকরিতে থেকে। বলা যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক কিছু না জেনেও ওই দায়িত্ব পালন করে এসেছি অন্যদের সঙ্গে মিলে। তখন এনসিটিবিরই এক কর্মকর্তা একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন, আমরাই কাগজের ভালো-মন্দ পার্থক্য ধরতে পারি না আপনারা কি করে বুঝবেন। কাগজের পার্থক্য ধরা নাকি হাইলি টেকনিক্যাল ব্যাপার! এক সিট কাগজ ওজনের মেসিনও নাকি আছে– আমরা অবশ্য দেখিনি। কাজেই একাজে পরিবর্তন পরিবর্ধন যা-ই কিছু ঘটুক তা কারো অজানা থাকে না। যাহোক, এখন অধিদফতর থেকে অফিসারদের একাজে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে পাঠান হয় কিনা তা বলতে পারলাম না। তবে একথা বলা যায় অধিদফতরের কোন কর্মকর্তা যুক্ত থাক আর না থাক এনসিটিবিকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

একথাও ঠিক, এনসিটিবি যে কাজ করে যাচ্ছে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে তা ভাবতে গেলে থমকে যেতে হয়। কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর হাতে তারা, বছরের প্রথম দিনে বই তুলে দিচ্ছেন– একে মহাযজ্ঞ বললেও কম বলা হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি এনসিটিবিকেই গুটিয়ে তুলতে হয়। ফলে এর জন্য তাদের সবাইকেই ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় বললেও কম বলা হবে। বলতে হবে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েন তারা। এমন কি যাদের কারিকুলাম নিয়ে গবেষণার কাজে মগ্ন থাকার কথা সারা বছর তাদেরও ওই প্রোডাকশনের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হয়। চীনদেশে শিক্ষা সফরে গিয়ে দেখে আসা আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলা লাগে। শুধু প্রাইমারির কারিকুলাম নিয়ে গবেষণার কাজে ৩০০জন গবেষক বা গবেষণা কর্মকর্তা সেদেশে সারা বছর কর্মব্যস্ত থাকেন। ফিল্ডের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রেখে তারা গবেষণার কাজ করে যান। এবং সেই গবেষণালব্ধ ফলাফল মোতাবেক প্রায় প্রতি বছরই কারিকুলামে সংযোজন-বিয়োজন ঘটে। সেখানে যে বই বেইজিং-সাংহাইতে পড়ান হয় সে বই পাহাড়ি প্রদেশ গাংসুতে পড়ান হয় না। সবাইকে বিনা মূল্যে বইও দেয়া হয় না। যার সমর্থ নেই তার লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয়ভার সরকার বহন করে। চীনে নয় ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া করা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। এই নয় ক্লাস পড়ার পরে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। তাও হয় এরিয়া ভিত্তিক। এটা ২০০৩ সালে দেখা।

এখানে যে কারণে কথাটা বলা তা হলো, কারিকুলামের কাজ যদি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে করার ব্যবস্থা আমাদের এখানে থাকত তা হলে এই যে রাতারাতি যে ঘটনা এনসিটিবির হাত দিয়ে ঘটে গেল তা হয়তো নাও ঘটতে পারত। সে যাহোক, কোন শ্রেণীর বাংলা বইয়ের কোথায় কী পরিবর্তন করা হয়েছে তা অনেকটা বিস্তারিতই এসেছে পত্রপত্রিকায়। কথা হলো বাংলা বিষয়ের উপর এ হামলা কেন? কবিতার কথায় ধরুন– কীভাবে তারা ওই কবিতার গায়ে হাত দিতে সাহস করল। এখানে ওই যে বললাম ক্ষমতা– যার বলে এটা করা যায়। কিন্তু কথা হলো ক্ষমতার উৎসটা কী। নির্বাচনের সময় ভোটের ক্ষমতা! সেও তো দেশের মানুষ দেখেছে একক ভাবে নির্বাচন করে কখন কতটা ভোট তারা পেয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের ভোটার সংখ্যা বাড়লে অন্যদেরও তো বেড়েছে। হ্যাঁ, তারা থেমে নেই একথা ঠিক। প্রাইমারীতে পড়া ছোট ছোট শিশুদেরও তারা হিজাব পরিয়ে ফেলেছে। কিশোরী-রমণী তথা বড়দের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া লক্ষ করে থাকবেন, কেমন আছেন জানতে চাইলে অনেকে এখন উত্তর দেয়, 'আলহামদোলিল্লাহ'। এবার একথাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যারা স্কুলের বাংলা বইয়ের পাঠ্যক্রমের ওপর এভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে তারা ধর্ম বিষয়ে কতখানি কী করতে পারে। কেউ যদি একটু কষ্ট করে পঞ্চম শ্রেণীর কথা তো পরে তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মশিক্ষার বইটা দেখেন তাহলে দেখবেন কী নেই সেখানে। একথা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না যে, আট-নয় বছরের একটা শিশু কী করে এসব আয়ত্ব করে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। পাঠ্যসূচি এবং প্রশ্নপত্র দেখে মনে হতে পারে ধর্ম বিষয়ে যা শেখার তা বুঝি সব এখানেই শিখিয়ে শেষ করে ফেলতে হবে। আর বোধ হয় কিছু পড়তে হবে না।

এক সময় শিশুরা ইংরেজি বাংলা অংক বিজ্ঞান বেশি বেশি করে পড়ত তারপর ইতিহাস ভূগোল ধর্ম এসব পড়ত। এখন একেবারে প্রাইমারি পর্যায় থেকে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়ে যা হয়েছে তা হলো, কোন একটা বিষয়ে একটু এদিক ওদিক হয়েছে তো জিপিএ-৫ গোল্ডেন হাত ছাড়া অর্থাৎ বাজারে চালু করে দেয়া কথায় বলতে গেলে, ওই শিশুর ভবিষ্যৎ বরবাদ। ভাবখানা এরকম, আমাদের শিশুরা যেন সবাই ভবিষ্যতে সব বিষয়েই মাস্টার্স হবে সব বিষয়েই পিএইচডি করবে। মেধা বিকাশের যে কথাটা বলা হয়ে থাকে, কাউকে সে সুযোগ দিতে চাইলে তার যে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকবে তাকে সে দিকেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ প্রথম দিক থেকেই করে দিতে হবে–সেটা কি হচ্ছে। এনসিটিবির ওই গবেষণার প্রসঙ্গ ওঠায় এ কথাটা বলা। হেফাজতে ইসলাম তথা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি যেভাবে যেমন করে হোক বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তিমূলে এবার যে আঘাতটা করল সেটা তারা করতেই পারে। তারা তো শুরু থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা এবং তাদের অঙ্গসংগঠন সশস্ত্রে নেমেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকাতে। ব্যর্থ হয়েছিল। আর সেই ব্যর্থ হওয়ারা এক সময় কৌশলে অপকৌশলে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্বে ঢুকে পড়েছিল। তাদের একটা নীল নকশা ছিল। সেই নীল নকশা অনুযায়ী ক্ষমতার ওই অংশিদারিত্বে ঢুকে এক পর্যায়ে তারা যে কাজটা করেছিল তা হলো, বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ লেখা স্কুলের পাঠ্যবই থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল এই বড় কাজটা আগে সেরে ফেলতে হবে। বাকি কাজগুরো অবস্থা বুঝে পর্যায়ক্রমে করলেও চলবে। সে সুযোগ তারা তখন পায়নি। এখন মনে হচ্ছে সেই নীল নকশা এখন হেফাজতে ইসলামের হাতে। তারা সেটা হাতে নিয়ে বসে নেই। জামায়েতে ইসলামীর মতো দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকতে হলো না তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারে আছেও যেতে হলো না তার আগেই তারা বাঙালি জাতীয় জীবনের মৌলিক জায়গায় হাত দিতে সক্ষম হয়েছে। স্কুলের প্রায় সকল শ্রেণীর বাংলা বইতে তারা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আমি মনে করি তাদের কোন দোষ নেই। তারা ওই যে বললাম ছলে বলে কৌশলে অপকৌশলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের কাজ চালিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তা সে চাপ প্রয়োগ করে হোক আর কূটকৌশল খাটিয়ে হোক। এখন যদি সেটাকে সঠিক ভাবে মোকাবিলা করা না যায় সে দোষ কার। দেশের মানুষ যদি তাদের কোন দিন ক্ষমতায় বসায় তখন তারা পারলে যেন দেশের স্কুল-কলেজ তুলে দিয়ে সব মাদরাসা বানিয়ে ফেলে সেকথা ভিন্ন। কিন্তু এখন তারা এমন একটা কাজ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে দিয়ে কীভাবে করিয়ে নিল? হয়তো তাদেরও (এনসিটিবি) না করে কোন উপায় ছিল না। কথাটা এখানেই। কারোর-ই কি কিছু করার ছিল না? অপারগতা জানিয়ে কলেজে নিজের মূল পদে ফিরে গেলে কী এমন হতো– পদত্যাগও করতে হতো না আমি মনে করি চাকরিও চলে যেত না।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বায়ান্নতে রফিক সালাম জব্বার বরতেরা জীবন দিয়ে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে যে সুরক্ষা দিয়ে গেছে তার মর্যাদা চিরকাল রক্ষা করে যেতে হবে যে কোন মূল্যে। দুর্যোগে কেবল দাঁড়িয়ে দেখলে চলবে না– [illegible] ক্লাইভের অল্পসংখ্যক [illegible] যেমন হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছিল যখন তারা (ক্লাইভের সৈন্যরা) কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিল। যার পরিণতির কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ	
[illegible] এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
স্বাক্ষর	